Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-III, April 2024, Page No.149-163
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

জীবন ও সাহিত্যে কথাকার নালিনী বেরা

পাপিয়া খাঁ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Although the introduction of the Creator is through the creation, it is essential to know the biography of the Creator. Because much of the Creator's life story remains hidden within the creation. While we cannot find a poet's biography in their poetry, it is equally true that understanding the poet's life intimately is essential for comprehending their poetry. Just as literary works often conceal aspects of an author's life, when we juxtapose literature with life, it becomes more meaningful and complete. Our celebrated wordsmith Nalini Bera's life and literature are intricately intertwined. His literary oeuvre spans the spectrum of time and societal context. Born in a region, he is connected to its people, family, geography, customs, rituals, ethics, and cultural expressions, including songs, festivals, and proverbs. Therefore, discussing his literature in the context of his life is highly relevant. In our contemplative essays, we have endeavoured to closely examine the symbiotic relationship between Nalini Bera's life and his literary endeavours.

যেকোনো সাহিত্যকে সম্পূর্ণরূপে জানতে লেখকের যাপিত জীবন সম্পর্কেও একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকা খুব আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কারণ লেখকের জীবন তাঁর মন-মানসিকতা খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখার মধ্যে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। কখনো তা খুব সুস্পষ্ট ভাবে ধরা দেয় কখনো বা তা তাঁর সৃষ্টির অন্তরালে বহমান থাকে। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'উৎসর্গ' কাব্যের ২১ সংখ্যক কবিতায় লিখেছিলেন 'কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে'[১] এই উক্তিটির প্রতিধ্বনি শোনা যায় তাঁর 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে, যেখানে তিনি বলেছেন- 'সকল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।'[২] কিন্তু জিজ্ঞাসু পাঠক কেবলমাত্র লেখকের সাহিত্যিক পরিচয়ে তৃপ্ত হতে পারে না, ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা অনুভূতি সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনায় রূপান্তরিত হয়ে আর এক জগৎ নির্মাণ করে। যে জগৎ বাস্তবের থেকেও অধিক বাস্তব হয়ে ওঠে। 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'কবিজীবনী' শীর্ষক প্রবন্ধে দান্তের কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- 'দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে, উভয়কে একত্রে পাঠ করিলে জীবন এবং কাব্যের মর্যাদা বেশি করিয়া দেখা যায়।'[৩] উক্ত প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছেন---'আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন কবির জীবনচরিত নাই। আমি সেজন্য চিরকৌতুহলী।'[৪] অর্থাৎ কবিকে এবং তাঁর কাব্যকে বুঝতে কোথাও কোথাও কবির ব্যাক্তিজীবনও প্রাসঙ্গিক

হয়ে ওঠে, একথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিছু ক্ষেত্রে স্বীকার করে নিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যকে জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে রচনাকারের যাপিত জীবনকে জানতে আগ্রহী হয়েছেন। 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ'-এর ভূমিকায় তিনি বলেছেন,---'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারলে আরও গুরুতর লাভ।'[৫] অর্থাৎ সাহিত্যিককে তাঁর জীবনের মধ্যে যেমন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না ঠিক সেভাবেই তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে যদি স্বচ্ছ ধারণা না থাকে তাহলে তাঁর সাহিত্য অনেকাংশে অধরা থেকে যায়। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যকে মিলিয়ে দেখলে সে দেখা অনেক বেশি অর্থবহ ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। আমাদের আলোচ্য কথাকার নলিনী বেরার সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিটি খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ নলিনী বেরার জীবন ও সাহিত্য একে অপরের সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে অন্বিত। তাঁর সাহিত্য রচনার সমগ্রতা জুড়েই চলতে থাকে শিকড়ের সন্ধান। তিনি যে সময় ও সমাজ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বড় হয়েছেন তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে সেই সময় ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তুলে ধরেছেন। যে অঞ্চলে তিনি জন্মেছেন সেখানকার মানুষ, তাঁর পরিবার-পরিজন, ভূগোল-ভূপ্রকৃতি, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, পূজা-পার্বণ-গান-ছড়া-প্রবাদ-এ পরিপূর্ণ তাঁর সাহিত্য ও জীবন। তাই তাঁর সাহিত্যের আলোচনায় খুব প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে তাঁর যাপিত জীবন ও জীবনভাবনার আলোচনা। কারণ, তিনি বলেছেন "যতদূর জানি, মনে প্রাণে বিশ্বাসও করি, একজন লেখক, সফল লেখক সবসময়ই চেষ্টা করেন তাঁর লেখালেখির মধ্যে একটা নিজস্ব 'জগৎ' তৈরি করে, ঘোরের জগৎ, যে জগতের বাসিন্দা সেই মুহূর্তে কেবল তিনি, এবং তাঁরই সৃষ্ট চরিত্রবৃন্দ। এই সমস্ত চরিত্র সৃষ্টির 'র-মেটিরিয়্যালস্' তিনি সংগ্রহ করেন যাপিত জীবন থেকে, কখনও কল্পিত ভাবনা থেকে।"[৬] আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা কথাকার নলিনী বেরার জীবন ও জীবনকে ছুঁয়ে থাকা সাহিত্যকর্মকে নিবিড় ভাবে দেখার চেষ্টা করেছি।

ছেলেবেলার জীবনযাপন, পরিবেশ একজন মানুষের সমস্ত জীবন গঠন নিয়ন্ত্রণ করে, তৈরি হয়ে যায় তার পৃথিবীকে দেখবার ভঙ্গি। বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতি পরিস্থিতির চাপে অবচেতনে আশ্রয় নিলেও তা প্রকাশের অবসর খোঁজে। নলিনী বেরার সাহিত্য সেই প্রকাশের আধার হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখা আত্মকথামূলক প্রবন্ধ, বিভিন্ন সাক্ষাৎকার, আলাপচারিতা থেকে আমরা জানতে পারি নলিনী বেরার জন্ম ২০ জুলাই ১৯৫২ তে। পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তের কাছাকাছি ঝাড়গ্রাম মহকুমার সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী সাঁওতাল-লোধা-ভুঁইয়া-ভূমিজ অধ্যুষিত জঙ্গলাকীর্ণ বাছুড়খোঁয়াড় গ্রামে, এক চাষি পরিবারে। শহুরে চাঞ্চল্য থেকে দূরে একদিকে নদী আরেক দিকে ওড়িশা লাগোয়া ঘনঘোর তপোবন 'জঙ্গলমহাল'। মাঝখানে নলিনী বেরার গ্রাম, (জে এল নং ৩৮। থানা নয়াগ্রাম) যে গ্রামে বাস করে তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষজনেরা। এখানেই তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। প্রথমে 'বাছুরখোঁয়াড় নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়', তারপর 'রোহিণী চৌধুরাণী রুক্মিণীদেবী হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল'-এ পড়াশোনা। স্কুলের গণ্ডি না পেরনো অবধি লেখক এই অঞ্চলেই থেকেছেন আত্মীয় পরিজন ও প্রকৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে। একদিকে ঘন জঙ্গল আর একদিকে সুবর্ণরেখা নদী লেখকের গ্রাম তথা ওই অঞ্চলকে সমগ্র জগৎ থেকে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। একপ্রকার আদিমতা মিশে ছিল অঞ্চলটির মধ্যে। ঐরকম একটা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করার কারণে তাঁর জগৎটা তখন ওইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ওই অঞ্চলটি "সভ্যতার দিক দিয়ে কিছুটা এগিয়েছে কিন্তু সেই আদিমতা এখনো থেকে গেছে"।[৭] তাঁর বহু গল্প-উপন্যাসে প্রকৃতির সেই আদিমতা ধরা পড়ে। প্রকৃতি যেন জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। "আমারও একখণ্ড স্বদেশ আছে, ফের বলছি জায়গাটার ভূগোল-

ইতিহাস সবই কেমন যেন অদ্ভুতুড়ে। অন্তত আমার কাছে।"[৮] সেই অদ্ভুতুড়ে অঞ্চলের তিনি প্রতিনিধি। সেই অঞ্চলটিকেই তিনি বহন করেন তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্য দিয়ে।

বাছুরখোঁয়াড় গ্রামটি নিতান্ত ছোট ছিল না। তিনশটি পরিবারের বসবাস ছিল সেখানে কিন্তু প্রথাগত পড়াশোনার জন্য তেমন কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না বললেই চলে। গ্রামে ছিল একটিমাত্র নিম্ন বুনিয়াদি স্কুল। লেখকের প্রাথমিক শিক্ষা এখানেই সম্পন্ন হয়। প্রাথমিকের পর ক্লাস ফাইভ থেকে রোহিণীদেবী হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে পড়াশোনা। "আমি নদী পেরিয়ে রোহিণী গ্রামের বড় স্কুলে এসে গেলাম"।[৯] প্রথম তাঁর স্বদেশ থেকে বিদেশ যাত্রা। কিন্তু এ যাত্রাপথ অতিক্রম করা খুব সহজ ছিল না। প্রথমত সেই সময় সুবর্ণরেখার বিস্তার অনেক বেশি ছিল, বর্ষায় যার একূল ওকূল দেখা যায় না। নদী পারাপারেরও তেমন কোনো সুব্যবস্থা ছিল না তখন। নদীর পরে প্রায় দুই-আড়াই মাইল বিস্তৃত বালুচর পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে পার করতে হতো ডুলুং নদী। ডুলুং নদীর পরে ছিল রোহিণী গ্রাম, তাঁর স্কুল। "আমাদের ইস্কুল গ্রাম থেকে দূরে, মাঝরাস্তায় একটা বড় নদী, নদী পেরুলে বিরাট চর, তাতে আকন্দ, টোপা কুলের ঝোপ, তাও পেরুলে আরেক নদী, সেই নদী পেরিয়ে আমাদের যেতে হত।"[১০] গ্রাম থেকে স্কুলের দূরত্ব অনেকটা, তাই হস্টেলে থেকেই তিনি পড়াশোনা করেছেন। নিজের গ্রাম থেকে দূরে থাকার কারণে গ্রামের প্রকৃতি, মানুষজন তাঁকে খুব বেশি করে আকৃষ্ট করত। অপেক্ষা করে থাকতেন হাটবারের জন্য, হাটে গ্রামের লোকেদের সঙ্গে দেখা হতো, কথা হতো, পরিবার পরিজনের খবরাখবর নেওয়া যেত। হস্টেলের বিধিনিষেধে হাঁপিয়ে উঠলে সপ্তাহান্তে ছুটির দিনে তিনি চলে যেতেন আশেপাশের গ্রামে। হরিপুরা-মৌভাণ্ডার-রগড়া-আন্ধারি-লাউদহ-কালরুই প্রভৃতি সব অবস্থাপন্ন চাষিদের বাস। তাদেরই ঘরের ছেলেরা রোহিণী গ্রামের বড় স্কুলে পড়াশোনা করে। তাদের সঙ্গে তাদেরই আমন্ত্রণে লেখকও মাঝে মাঝে চলে যেতেন সেই সকল গ্রামে। সেই সকল গ্রাম, গ্রামের প্রকৃতি, মানুষজন, তাদের যাপন প্রণালী খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখতেন। তাঁর লেখার মধ্যে সেই সকল দিনের স্মৃতি, ভালোলাগা মন্দলাগা নানান ঘটনা, উপলব্ধির কথা উঠে এসেছে। স্কুল হস্টেলের রাঁধুনি টুনি ঠাকুরের কথা তাঁর লেখায় ফিরে ফিরে এসেছে। হায়ার সেকেন্ডারিতে প্রতিটি বিষয়ে লেটার পেয়ে জেলায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন। মেধাবী ছাত্র হওয়ার জন্য যেমন বৃত্তি পেয়েছেন তেমনি শিক্ষকদের থেকে পেয়েছেন অপরিসীম স্নেহ। ১৯৬৮ সালে তিনি হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেন যেটা ছিল নকশাল আন্দোলনের কাল। হায়ার সেকেন্ডারির পর তিনি মেদনীপুর কলেজে ভর্তি হন। কলেজে পড়ার সামর্থ্য তাঁর ছিল না কিন্তু আর্থিক প্রতিকূলতা তাঁর জ্ঞানার্জনে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। কেবল জেদের বশে নদী পারের জমি বিক্রি করে তিনি মেদিনীপুর কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে পড়তে শুরু করেন। টিউশন করে তিনি পড়াশোনার খরচা নির্বাহ করতেন। "নদীধারের পাঁচ কাঠা পালজমিন জলের দরে বেচে দিয়ে জেদের বশে মেদিনীপুর কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম সায়েন্সের স্টুডেন্ট হয়েও বাংলায় অনার্স নিয়ে।...মনমোহন দত্ত, বাঙলার 'হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট' আমার অবস্থা বুঝে জোগাড় করে দিলেন গোটাকতক টিউশনি।"[১১] বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র হয়েও নিজের ভালো লাগার কারণে তিনি বাংলাকে পড়াশোনার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু ফিজিক্সের অধ্যাপক প্রীতম মুখোপাধ্যায়ের উপদেশে তিনি বাংলা ছেড়ে ফিজিক্স-এ ভর্তি হন। ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা চলাকালীন ল্যাবরেটরিতে বোমা বিস্ফোরণ হয়। নকশাল আন্দোলনের আগুন তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। "তখন এই বাঙলায় বড়ই দুঃসময়, টালমাটাল কাল!...ঠিক ছ'মাসের মাথায় আচমকা বোমাবাজিতে একদিন ফিজিক্সের ল্যাবরোটোরিতে সেই জাপানি পাইলট পেনটাকে,...আর 'রাজাবাজার মেস'-এর বোর্ডারদের নামে 'পুলিশী

ওয়ারেন্ট' গচ্ছিত রেখে চিরতরে মেদিনীপুর ছেড়ে নদীপারের ছেলে নদীর এ-পারে ফিরে এলাম!"[১২] শিক্ষা ব্যবস্থাকে অমান্য করার উদ্দেশ্যে ঘটেছিল ওই বোমা বিস্ফোরণ। নতুন দিনের স্বপ্ন নিয়ে লেখকও তখন জড়িয়ে ছিলেন আন্দোলনের সঙ্গে। সুন্দর হাতের লেখার কারণে আন্দোলনের যাবতীয় শ্লোগান লেখার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যাস্ত ছিল। তিনি যে মেসে থাকতেন সেখানেই চলত আন্দোলনকারীদের গোপন মিটিং। সেই মেসের বোর্ডারদের নামে পুলিশী ডায়েরি হয়। অন্যান্যদের সঙ্গে নলিনী বেরাও তখন আত্মগোপন করলেন। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে তিনি গ্রামে ফিরে এলেন। গ্রামে ভবঘুরের মতো দিন যাপন করতে শুরু করলেন। তারপর নিজের উদ্যোগে এবং গ্রামের আরো কিছু মানুষের সহযোগিতায় একটি জুনিয়ার হাইস্কুল শুরু করলেন যেখানে ক্লাস ফাইভ-সিক্স পড়ানো হতো। নিজেরাই ক্লাস নিতেন আবার নতুন ক্লাসঘরের দেওয়াল তুলতেন, ছাউনি বানাতেন। যারা নিম্ন বুনিয়াদি থেকে ফোর পাশ করেছিল তারা অনেকেই সেখানে ভর্তি হয়েছিল। নলিনী বেরা একাই তাদেরকে দু'বছর পড়িয়েছিলেন। অন্যদের শিক্ষাদান করলেও তাঁর লেখাপড়া থেমে গেছিল। কিন্তু পুরনো স্কুলের শিক্ষকদের উপদেশে এবং উদ্যোগে তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রে পুনঃপ্রবেশ ঘটলো। আর মেদিনীপুর নয় এবার ঝাড়গ্রাম শহর। "মনে মনে তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর কিছুতেই হারবো না, প্রয়োজন হয় মাটি কামড়ে পড়ে থাকবো।"[১৩] তারপর ঝাড়গ্রাম ও কলকাতায় অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়াশোনা। ১৯৭৫ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। অপরিসীম কষ্ট করে তিনি তাঁর পড়াশোনা চালিয়ে গেছিলেন। "তখন হাওড়ায়। ফিফটি-টু নম্বর বাসে কলকাতা যাই-আসি। ছোটমতো দু'চারটে টিউশনি, সংসার আর চলে না। আছি কষ্টে-মষ্টে। কোনো-কোনোদিন হেঁটেই কলকাতা ঘুরে আসি। ফিফটি-টু নম্বর বাসটা পাশ দিয়ে হেসে-খেলে গড়িয়ে যায়।"[১৪] এমনকি অনাহারেও দিন কাটাতে হয়েছে তাঁকে। "একদিন গ্রীষ্মের রাত। পকেটে খোলামকুচিও নেই। খুরুট ব্যায়াম সমিতির ফুলবাগানে হাওয়া দিচ্ছে ফুরফুর। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। এসব দেখে তো পেট ভরবে না আর। সোজা জগন্নাথের হোটেলে ঢুকে গেলাম। জগন্নাথ হাতল ভাঙা চেয়ারে বসে ঢুলছে। তার হাতে সুনীতি চ্যাটার্জির 'ও-ডি-বি-এল' বইটা গছিয়ে দিলাম। 'বইটা রেখে আজকের মতো খেতে দিন।'...সুনীতিবাবুর 'ও-ডি-বি-এল'-এর বিনিময়েও একমুঠো খেতে দেয়নি জগন্নাথ!"[১৫] কিন্তু তিনি হার মানেননি। তাঁর জেদ অটুট ছিল। পড়াশোনা শেষ করে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৯৭৮ সালে ডব্লিউ.বি.সি.এস পরীক্ষায় 'এ' গ্রুপে স্থান পেয়ে তিনি রাজ্য সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিক রূপে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কলকাতাতে থাকাকালীন তাঁর রত্নাদেবীর সঙ্গে প্রণয় ও পরবর্তীতে বিবাহ। বর্তমানে তিনি সস্ত্রীক হাওড়ায় বসবাস করেন। ২০১৪ সালে তিনি অবসর নেন। অবসরের পরেও প্রায় তিন বছর কলকাতা কর্পোরেশনের ট্রাইব্যুনাল জাজ হিসেবে কাজ করেন। কর্মসূত্রে তিনি নানা স্থানে থেকেছেন। সঞ্চয় করেছেন নানান অভিজ্ঞতা। সেই সকল অভিজ্ঞতা দিয়ে গড়ে তুলেছেন বেশ কিছু গল্প ও উপন্যাস। কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেও সাহিত্যজীবন তাঁর একইভাবে বহমান।

পড়াশোনা ও কর্মসূত্রে তাঁকে থাকতে হয়েছে নিজের জন্মভূমি থেকে দূরে। কোনও উৎসব অনুষ্ঠান বা কোনও প্রয়োজন ছাড়া গ্রামে যাওয়া হয়না। "অধুনা শহরে থাকি, পূজাপার্বণে গ্রামে ফিরি।"[১৬] তাই একটা বিচ্ছিন্নতাবোধ সর্বদা তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল। আর এর থেকেই বোধহয় তাঁর সাহিত্য চর্চার ভূমিতে পদার্পণ। তাঁর জন্মস্থান, সেখানকার মানুষজন, আত্মীয়-স্বজন, প্রকৃতি ইত্যাদির প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা ও কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে বারবার তাঁর গ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, সেখানকার লোধা-সাঁওতাল-হাঘরে-যাযাবর-কুমোর-হাটুয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন, তাদের আচার, অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, রীতিনীতি তথা তাদের

জীবনকথাই নলিনী বেরার প্রতিটি রচনার পাতায় পাতায় বিধৃত হয়েছে। গ্রাম বাংলার লোকায়ত জীবনটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ছোটবেলা থেকেই। নিরেট বাস্তবতা কখনো প্রত্যক্ষ কখনোবা পরোক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে তাঁর সাহিত্যে। বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে প্রতিটি শ্রেণির মন-মানসিকতা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষত অন্ত্যজ সমাজের জীবনালেখ্য এক জীবন্ত দলিলরূপে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছে ব্যাপ্তিময়, সুবিস্তৃত। তাঁর সাহিত্য তাঁর অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। আর এজন্যই তাঁর জীবন ও সাহিত্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নলিনী বেরা কথাসাহিত্যিকরূপে খ্যাত হলেও কবিতা দিয়েই তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা। 'যে জানে শুশনি পাতা'; 'কতদূরে আছ সুবর্ণরেখা' প্রভৃতি তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু কবিতায় তাঁর বক্তব্য বিষয় যেন পরিপূর্ণতা পাচ্ছিল না। তাঁর পরিসরকে ধরতে পারছিল না। তাই কথাসাহিত্যকেই তিনি তাঁর প্রকাশের আধার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এবং গল্প উপন্যাসের মধ্য দিয়ে নিজের প্রতিভাকে বিচ্ছুরিত করতে লাগলেন। যদিও তাঁর লেখায় কবি নলিনীর সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁর প্রথম গল্প 'ঝাড়েশ্বর পানির ইলিশ ধরা'; প্রকাশিত হয় 'দৈনিক বসুমতি' পত্রিকায় ১৯৭৮ সালে। যদিও তাঁর প্রথম সার্থক ছোটোগল্প 'বাবার স্মৃতি'; এর পরের বছর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাস 'ভাসান'; প্রকাশকাল ১৯৮১ সাল। অর্থাৎ কথাসাহিত্যের জগতে তাঁর পথচারণা সত্তরের দশক থেকেই তারপর থেকে তিনি আর থেমে থাকেননি। তাঁর কলম থেকে নিঃসৃত হয়েছে 'শবর চরিত'; 'ভাসমান'; 'ইরিনা ও সুধন্যরা'; 'ঈশ্বর কবে আসবে'; 'অপৌরুষেয়'; 'চোদ্দমাদল'; 'দালানের পায়রাগুলি'; 'অমৃত কলস যাত্রা'; 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা'র মতো অসাধারণ সব উপন্যাস। উপন্যাসের মতোই তিনি অবিরাম ধারায় লিখে গেছেন একের পর এক অসাধারণ সব ছোটোগল্প। 'বাবার স্মৃতি'; 'হোমগার্ডের জামা'; 'বরফ পড়া দিনগুলোয়'; 'ভূতজ্যোৎস্না'; 'বর্ষামঙ্গল'; 'নৌকাবিলাস'; 'অপারেশন পাঁচকাহিনা' প্রভৃতি ছোটোগল্পের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। স্বল্পায়তনের এই শিল্পরূপের মধ্য দিয়ে তাঁর লেখনি গতি লাভ করেছে, তা হয়ে উঠেছে নিরেট অনুষঙ্গের দ্যোতক। এছাড়াও 'রোদনের ভাষা', 'জয়ের জন্য একটি পালক', 'গুণীন বৃত্তান্ত ভূতপুরাণ', 'উঠিলা সুয়ারী বসিলা নারী' প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সেই সঙ্গে 'তিরিয়ো আড়বাঁশি', 'বাস্কেদাকা', 'দিঘী তার মাঝখান থেকে' প্রভৃতি শিশুসাহিত্যও তিনি রচনা করেছেন।

নলিনী বেরার প্রায় সকল রচনাতেই কম বেশি আত্মজৈবনিক উপাদান আছে। কল্পনা ও বাস্তবের মিশেলে গড়ে ওঠে কাহিনি পট। তাই 'নলিনী' নামেই অধিকাংশ কাহিনীর মধ্যে লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ ঘটে। তিনি তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে নিজের ভূখণ্ডকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। তার মতে---"যে ভূখণ্ডে লেখক জন্মেছেন, সে গ্রাম হোক শহর হোক, সেই খণ্ড-ভূখণ্ডের ভূগোল-ভূপ্রকৃতি গাছপালা মানুষজনের জীবনচরিত পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের নিত্য নতুন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে লেখক আর্কিওলজিস্টের মতোই আবিষ্কার করে চলেন তাঁর স্বদেশকে, চলতে চলতে পৌঁছে যান খণ্ড থেকে অখণ্ডে।"[১৭] 'শবর চরিত' উপন্যাসটি শবরদের জীবন আবিষ্কারেরই আখ্যান। 'অপৌরুষেয়' উপন্যাসে একইসঙ্গে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের কথা বলা হয়। 'চোদ্দমাদল' যেন আত্ম-আবিষ্কারেরই উপন্যাস। 'ইরিনা ও সুধন্যরা' তাঁর নিজের জীবনের কাহিনি। 'বাবার স্মৃতি'; 'হোমগার্ডের জামা'; 'কুসুমতলা'; 'শতরঞ্জি'; 'খোরপোষ' প্রভৃতি ছোটোগল্প তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এভাবেই তিনি তাঁর জীবন থেকে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করে নিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যে বর্ণিত ঘটনা, চরিত্র, পরিস্থিতি কোনো কিছুই সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। বাস্তব ও

কল্পনার মিলিমিশিতে সেগুলি কায়া লাভ করেছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা আর কল্পনার মিশ্রণে তা হয়ে উঠেছে অধিকতর বাস্তব।

নলিনী বেরা তাঁর 'আত্মীয় পরিজন-ভূগোল-ভূপ্রকৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন নস্টালজিয়া নিয়েই তাঁর সাহিত্যের পথে হাঁটা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের বলে দিয়েছেন, আরম্ভের আগেও আরম্ভ আছে প্রদীপ জ্বালাবার আগে যেমন সলতে পাকানো। তেমনই প্রত্যেক সাহিত্যিকেরও সাহিত্যের যাত্রা শুরু করার আগে একটা প্রস্তুতি পর্ব থাকে। জগৎ জীবন সম্পর্কে কতকগুলি নিজস্ব উপলব্ধি অনুভূতি সাহিত্যের ভিত্তিভূমিরূপে গড়ে ওঠে। নলিনী বেরার ক্ষেত্রে এই প্রস্তুতি পর্বের সূচনা হয়েছিল বাল্যকালেই। গ্রামে প্রথাগত বিদ্যাচর্চার সুব্যবস্থা না থাকলেও পুঁথি পাঠের এক বিরাট আয়োজন থাকতো। গ্রামের হরি মন্দিরে পুঁথি পাঠ করা হতো। লেখকের বাবা সেই পাঠ করতেন। "শিশুকালে যখন বাবার সঙ্গে শুতাম, ঘুম ভাঙলে ভোরের দিকে দেখতাম বাবা ডিবরির আলোয় মহাভারত পাঠ করার আগে গুনগুন করে পাঠের সুর ভাঁজছেন, স্পষ্ট মনে আছে, 'হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ হরে। কৃপা কর রমানাথ মুকুন্দ মুরারে'।। বই খুলে তৎক্ষণাৎ ঢুকিয়ে দিতেন, আলো জ্বালি দেখ এবে যাজ্ঞসেনী সতী। তোমা হিংসি কীচকের এতেক দুর্গতি।"[১৮] ওই সুরই তাঁকে সাহিত্যের প্রতি আসক্ত করেছিল। এখনও যেন তাঁর মনের মধ্যে ওই সুর ধ্বনিত হয়। এছাড়াও বই বলতে থ্রি-ফোরের 'কিশলয়' সেই 'আম্রজাতক'; 'অবাক জলপান'; 'রাজার অসুখ'; 'কন্বমুনির আশ্রম', তবে কে বিভূতিভূষণ কে অবনীন্দ্রনাথ জানতেন না, কিন্তু লেখাগুলি বারবার করে পড়তেন।

সাহিত্যের রস গ্রহণের মনটি তৈরি হয়ে গেছিল সেই শৈশবেই। সেই সঙ্গে মনের অগোচরে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল সাহিত্যিক মননটিও। কিন্তু কেবল সাহিত্য পাঠ নয় সেই সঙ্গে সাহিত্য রচনার প্রতিও ঝোঁক ছিল সেই ছোটবেলা থেকেই। গ্রামে মাটির দেওয়ালে, গাছে নিজেদের লেখা কবিতা আঠা বেলের দিয়ে আটকে দিতেন। হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে 'অঙ্কুর' নামক পত্রিকায় তিনি লেখালিখি করতেন। সেখানে পি.কে.দে.সরকার-এর ট্রান্সলেশন থেকে পড়া বিভিন্ন রচনাংশ তাঁকে আকৃষ্ট করত। মনে মনে ভাবতেন এরকম লেখা তিনিও লিখবেন। সাহিত্য অনুশীলন তাঁর কোনোদিনও থেমে থাকেনি। বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র হয়েও তিনি বাংলা পড়তে গেছিলেন, সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বশত। পরবর্তীতে বাংলা নিয়ে পড়াশোনা না করলেও কলেজে পড়াকালীন তাঁর সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়েছিল। পড়েছেন দেশী বিদেশী বহু সাহিত্য, জেনেছেন সাহিত্যিকদের সম্পর্কেও। সেই সঙ্গে অব্যাহত ছিল তাঁর লেখনী। কলেজ পত্রিকায় তাঁর বহু লেখা প্রকাশিত হতো। ঝাড়গ্রামে পড়াকালীন তিনি 'শালপাতা' নামক পত্রিকা-সম্পাদনার কাজও করেছেন। কলেজে তিনি 'ভবঘুরে' ছদ্মনামে লেখালিখি করতেন, কিন্তু কলেজ ম্যাগাজিনে সেই নাম দেওয়া যাবে না বলে অধ্যাপকের অনুরোধে স্বনামে লেখালিখি শুরু করলেন। সত্তর দশকের অভিঘাত তাঁর লেখনীকে ক্ষুরধার করেছিল। প্রচলিত ধারা থেকে সরে এসে তিনি নিজের স্বতন্ত্র পথ নির্মাণে ব্রতী হলেন। যাপিত জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কথকতা পাঁচালি রামায়ণ মহাভারতের আদলে তিনি তাঁর সাহিত্যের কায়া নির্মাণ করতে থাকলেন। বিগত চার দশক ধরে কথা সাহিত্যিক নলিনী বেরা অবিরাম ধারায় লিখে গেছেন একের পর এক উৎকৃষ্ট গল্প ও উপন্যাস। কিন্তু এখনো তিনি মনে করেন,--- "আমি যা লিখতে চাইছি সেটা লিখে ফেলেছি এমনটা নয়। এখনো অপেক্ষায় আছি, কবে সেই লেখা লিখতে পারব। তৃপ্তি এখনো আসেনি।"[১৯] তাই বর্তমান সময়েও সেই ধারা একই ভাবে বহমান।

নলিনী বেরার গ্রাম ছিল 'আউটসাইডার' পাণ্ডববর্জিত এক গ্রাম। তাই সে গ্রামে একজন 'গগাঁ' বাটভিখারি এলেও রীতিমতো হুল্লোড় পড়ে যেত। যার বাড়িতে যা থাকতো সকলই এসে পড়ত ভিখারির ঝুলিতে। ছোট বাচ্চারা তাকে ঘিরে ধরত। আর এহেন গ্রামে শীতের মরসুমে যখন বেজি-বাঁদর-হনুমান-গাধা কী রামছাগল নিয়ে হা-ঘরে যাযাবরেরা বটতলায় এসে জড়ো হতো, তখন বটতলায় গ্রামের লোকেদের মেলা বসে যেত। ঘাগরাপরা হাঘরে যাযাবরীরা গ্রামের মানুষের কাছে বিশ্বসুন্দরী। বটতলায় থাকা বাঁদরদল আর তাদের নিয়ে থাকা এই মানুষজনদের প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করতেন নালিনী বেরা। তাই সকাল হতে না হতেই দৌড় দিতেন বটতলার দিকে। "সেই আমারও কী যে হয়ে গেল, শুধু রাতটুকু পোহানোর অপেক্ষা! সকাল হলেই দৌড়ুতাম বটতলার দিকে।"[২০] কৌতূহল বশত খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন তাদের জীবনযাপন প্রণালী। স্মৃতিতে রয়ে গেছে তার উজজ্বল প্রতিচ্ছবি। তাঁর বেশ কিছু গল্প ও উপন্যাসে অতীতের স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছে এই বেদুইন-যাযাবরদের কাহিনি।

> "হা-ঘরে বাজিকরদের দলে ভিড়ে হা-ঘরে বাজিকরও হতে পারলাম না। কিন্তু একটা গন্ধ, সেই গন্ধটা-সেই গন্ধটাই আমাকে হা-ঘরে ঘর-ছাড়া করল। বাসে-ট্রামে-গ্রামে-গঞ্জে হাটে-বাজারে যখন যেখানে থাকি, সময় নেই অসময় নেই ভুস করে ভেসে ওঠে, ওই নিয়েই আমার লেখালিখি, শুরু হল পথচলা।"[২১]

লেখকের মনে এই হা-ঘরে বাজিকরেরা একটা স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল। মানুষকে জানার বোঝার আগ্রহ থেকেই তাঁর আভিজ্ঞতা বহুবিস্তৃতি লাভ করেছিল। সমালোচকের ভাষায়,--- "মানুষই তাঁর সৃজনভাবনার অন্তবীজ"।[২২] পল্লিপ্রকৃতি, সমাজ বাস্তবতা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদির আবর্তে মানুষের বিবর্তনকেই তিনি বারবার অবলোকন করেছেন। উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাস করার কারণে হাটুয়াদের সঙ্গেও তাঁর ওঠাবসা ছিল। "বড়োডাঙায় সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে হাটুয়াদের আসর বসত,-'আ লো ঘৈতা লো ঘৈতা লো...। আর এসবেরই নাটের গুরু নুয়াসাহীর অনন্ত দত্ত'।"[২৩] এই আসরে হাটুয়া নাচ, চুড়িয়া গান হতো। এই নাচ-গানের আসর নলিনী বেরাকে খুব আকৃষ্ট করত। লাইবুকু বা নবীন ছিল তল্লাটের সেরা গায়ক, মেয়ে সেজে সে যখন গান ধরত তখন দর্শকদের মধ্যে হুল্লোড় পড়ে যেত। সেই নবীন হয়ে গেছিল লেখকের 'রোল মডেল'। স্বপ্নে জাগরণে শুধু নবীন আর নবীন, তার উপর অনন্ত দত্তেরও পছন্দ হয়ে যায় তাঁকে। সপ্তাহে সপ্তাহে অনন্ত দত্ত তাঁর মায়ের কাছে এসে বলে যেত, "বউদি গো, টকাটাকে মোর নাটুয়া দলে সঁপি দও, মু গড়িপিটি মানুষ করি নিমু।"[২৪] কিন্তু মায়ের অমতের কারণে নাটুয়া দলে তাঁর আর যাওয়া হল না।

নলিনী বেরার স্মৃতিচারণা ও রচিত সাহিত্য থেকে তাঁর পরিবার, পরিবারের মানুষজন, তাদের আচার, আচরণ, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। বাবা গিরিশচন্দ্র বেরা, মা ঊর্মিলা দেবী। তাঁর বাবারা ছিলেন পাঁচ ভাই। বাল্যকালেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁর বাবা ছিলেন শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী একজন মানুষ। কায়িক পরিশ্রম সেভাবে করতে পারতেন না। আগুনে পুড়ে তিনি প্রতিবন্ধী হয়ে যান। তাঁর দ্বিতীয় গল্পটি বাবাকে নিয়েই লেখা যেটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নলিনী বেরার মতে এটি তাঁর প্রথম সার্থক গল্প। গল্পটির নাম 'বাবার স্মৃতি'। ছাড়াও ছোটোকাকা, মেজকাকা এবং ন-কাকি তাঁর লেখায় ও মনের অনেকটা পরিসর জুড়ে আছে। মেজকাকা ছিলেন কোবরেজ। তাঁর বাবার অবর্তমানে বাড়ির কর্তাও তিনিই ছিলেন। তাঁর উপরে কথা বলার সাহস ছিল একমাত্র ন-কাকির। 'পুষ্করা' গল্পে আমরা ন-কাকির যে চরিত্র

দেখতে পাই, বাস্তব জীবনেও তিনি একেবারে ঐরকমই ছিলেন। মেজকাকাও তাঁকে মান্যতা দিত। ছোটকাকা বিজয়চন্দ্রের কথা আমরা নলিনী বেরার বিভিন্ন লেখায় বার বার পাই। ছোটবেলায় রবিনহুড পড়ে ছোটোকাকা তখন রবিনহুড সেজে তীর ধনুক নিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন আর লেখক তখন লিটিল জন। অন্যান্য কাকা-কাকিদের কথা তাঁর লেখায় কম উঠে এসেছে। পরিবারের মধ্যে ঠাকুমা অঞ্জনাসুন্দরীর কথাও আমরা পেয়েছি তাঁর একাধিক লেখায়। পরিবার সম্পর্কে নলিনী বেরা বলেছেন, - "একদিকে নদী আরেকদিকে ঘনঘোর জঙ্গল, মাঝখানে আমার জন্মভূমি গ্রাম, জন্মভিটা। বাবা-কাকাদের ঘর। বাবা কাকাদের-মা, আর আমার মা-কাকিরা।...অঝোরঝর বর্ষণ, খড়ের চাল ভেদ করে জল এসে মেঝেয় পড়ছে অবিরাম। মা-কাকিরা গিনা-বাটি-তাটিয়া পেতে রেখেছে বৃষ্টির ধার বরাবর"।[২৫] এই বর্ণনা তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা বলে দেয়। "বৃষ্টির ধরণ দেখে মনে হত-এ বৃষ্টি আর কখন থামবে না,...ভয়ে আতঙ্কে আরো বেশি বেশি করে জড়িয়ে ধরতাম বাবা-কাকাদের মাকে। বাবা-কাকাদের মা ওড়িশার যাঁসড়ার অঞ্জনাসুন্দরী তখন কাহিনী শুরু করেছে''।[২৬] ছেলেবেলায় শোনা ঠাকুমার মুখের সেই গল্প-কাহিনির বেঁটে-বাটকুল 'গুরগুড়িয়া'কে 'শবর চরিত' উপন্যাসে পাই। 'চোদ্দমাদল' উপন্যাসে আমরা অঞ্জনাসুন্দরীর গল্প শুনি, যে পুত্র শোকে শোকাতুর। "প্রায় দিন সন্ধ্যেবেলা তার কাছে জড়ো হলে একদা ময়ূরভঞ্জ জেলার যাঁসড়া গ্রামের অঞ্জনা সুন্দরী নাকি সুরে রোদন করতো। প্রথম প্রথম তার কাঁদবার হেতু পায় না, ক্রমে সে যখন আমাকে আঁকড়ে ধরে অন্ধকারে পাগলের মতো নাকে মুখে কাঁপা কাঁপা আঙুল বুলাতো আর বলতো, 'তুই কেন আগে গেলি রে তোর আগে আমার কেন মরণ হলো না রে...' আমাদের বুঝতে বাকি থাকত না, বড়ছেলের শোকই বুড়িকে অহরহ কাঁদায়।"[২৭] বড় ছেলে অর্থাৎ লেখকের বাবা। লেখক খুব অল্প বয়সেই পিতৃহারা হন। বাবাকে হারানোর বেদনা তার লেখার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। 'বাবার স্মৃতি' ছোটোগল্পে 'ভাসান'; 'চোদ্দমাদল'; 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা', প্রভৃতি উপন্যাসে বারবার লেখক তাঁর বাবাকে স্মরণ করেছেন। বাবার মৃত্যুর ফলে এক শূন্যতাবোধ তাকে গ্রাস করেছিল। 'ভাসান' উপন্যাসে পিতৃহারা কিশোরের যন্ত্রণা পাঠকের মনকেও ভারাক্রান্ত করে। নলিনী বেরার লেখায় যার কথা ফিরে ফিরে এসেছে সে হলো ছোটোকাকা বিজয়চন্দ্র। খামখেয়ালী আপনভোলা মানুষ সে, গানবাজনা, যাত্রাপালা নিয়েই মত্ত থেকেছে। মন হলেই সে এর তার বাড়িতে গিয়ে গান করে শোনায় - "ওপারে তুমি শ্যাম এবারে আমি, মাঝে নদী বহে রে'। গানান্তে এর-তার বউকে প্লুতস্বরে জিজ্ঞাসা করেছে, 'বৌদি রেডিওর মতো শোনাচ্ছে কি?''[২৮] বিজয়চন্দ্র আজীবন এমনই থেকেছেন চারিদিকে যখন মাওবাদী আর যৌথ বাহিনীর সন্ত্রাস তখনও ছোটোকাকা নির্বিকার। তখনো তিনি ভাইপোর কাছে হারমোনিয়াম দাবি করেন, 'বলেছিলি কিনে দিবি একটা হারমোনিয়াম'।[২৯] লেখকের মেজকাকা ছিলেন খুব নামকরা কবিরেজ। "দূর দূর গ্রাম থেকে সাঁঝ-সকালে রাত-বিরাতে কল আসছে। কারোর বুকের পদ্মল ঘা, কারোর বা সন্নিপাতি, মধুমেহ। তার মধ্যে দিনে একটা-দুটো 'সাপকাটি' তো আছেই। কাকার ক্লান্তি নেই, রোগীর অবস্থা বুঝে রোগের নাম শুনে ওই যা ভুরু কোঁচকানো। তারপর ওষুধের বটুয়া হাতে ধন্বন্তরির মতো বেরিয়ে পড়া।"[৩০] এত সাফল্যের পরেও কেবল একটা চিন্তা তাকে হতাশ করতো। তা হলো, তাঁর অবর্তমানে কবরেজগিরি কার উপর বর্তাবে। "অগত্যা মা কাকিরা যোগ্য উত্তরসুরি ভেবে আমাকে ঠেলে-গুঁজে পাঠিয়ে দিতেন দু-চারটা সাপকাটির মন্তর অন্তত, অমন সুযোগ হেলায় হারাস না সেই হাঁটুমুড়ে বসা, হাঁটুতে কাপড় ঢেকে বসা মেজোকাকা ফিসফিস করে আউড়ে চলেছেন, 'মেঘ কনকন আঁধার রাতি সাপে মারলো ঘা...' আর যায় কোথায়? মুখস্থ করছি বটে, কিন্তু মুহুর্মুহু মনে হচ্ছে, এই বুঝি একটি 'হলহলিয়া' ওই বুঝি একটা 'দুধিয়া'।"[৩১] এবং শেষ পর্যন্ত

কবিরাজ হওয়ার চান্সটাও মাটি হয়ে গেল তাঁর। কবিরাজ না হলেও মেজকাকার সঙ্গে কাটানো সময় তার জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। মেজকাকার কাছে ওষুধ নিতে আসা বহু বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শ তাঁর অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করেছিল যার প্রতিফলন পরবর্তীতে তাঁর সাহিত্যে দেখা যায়। সেই সঙ্গে মেজকাকার চরিত্রটিও উঠে এসেছে তাঁর বেশ কিছু রচনার মধ্যে। বাবার মৃত্যুর পর মায়ের সঙ্গে লেখকের একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল 'ভাসান' উপন্যাসে তার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু পরিবারের ন-কাকির সঙ্গে তাঁর এক প্রকার সখ্য ছিল। ন-কাকির ব্যক্তিত্ব তাঁকে আকৃষ্ট করত। না 'নাচুয়া' না 'কবরেজ' না 'বাজিকর-যাযাবর' কোনটাই নলিনী বেরা হতে পারেননি। কিন্তু জীবনের সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁর জীবন পটে যে রেখাঙ্কন করেছিল তার প্রতিলিপি হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যগুলি।

পরিবারের পাশাপাশি ওই অঞ্চলে বসবাসকারী লোধাশবর ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন কথাও খুব অনুপুঙ্খভাবে উঠে এসেছে তাঁর রচনায়। "এই লদ্ধা বা লোধা, শবররা আমার আত্মীয়, বড় আপনার জন। কী শীত কী বর্ষায় আমাদের গ্রামের কুলহী রাস্তায় এদের হাঁটা-চলার বিরম নেই। কখনও কাঠভার কাঁধে, কখনও ঝুড়িকাঠ মাথায়, কখনো দুকাঁধে ছ'টা ছ'টা বারোটা শালবল্লা নিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে হেঁটে যাচ্ছে, কখনো হাট ফেরত পুঁটলি মাথায়, কখনো শিকা-বাঁহুকের ডগায় কলমি শাকের আঁটি বেঁধে উত্তর থেকে দক্ষিণে নিজেদের গ্রামে ফিরছে। যাওয়ার সময়েও পায়ে-বালিতে মসমস্ফেরার সময়ও পায়ে-বালিতে মস্মস্আওয়াজ। এটাই যেন তাদের হাঁটা চলার ছন্দ, 'নেপুর ঝিনকি'।"[৩২] এই লোধা শবরদের তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। ছেলেবেলায় লোধাছেলেদের সঙ্গে ওল-ডাঁটার ফুটবল খেলেছেন, "মা-কাকিমাদের প্রায় মরসুমে নিত্যদিন লোধাবউড়ি ঝিউড়িদের কুড়কুড়িয়া-কাড়হান-পরব কী বালিছাতু 'সাপ্লাই' করা, কেঁদ্-ভেলা-ভুড়রু-কুল-বৈঁচি ইত্যাকার নানাবিধ ফল, 'কুরকূটপটম' বা পিঁপড়ের ডিম, জাড়া-বরবটিপানআলু-খামআলু-চুরচুআলু বা আঁউলা-বাঁউলার যোগান দেওয়া"।[৩৩] তাদের যেমন নিত্যদিন যাতায়াত ছিল তেমনই লেখকও যখনই সময় পেয়েছেন হুটহাট চলে গেছেন সাঁওতাল-লোধা অধ্যুষিত অঞ্চলে। তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তিনি ছিলেন অতি পরিচিত। এই লোধা শবরদের নিয়েই তিনি রচনা করেছিলেন, 'শবর পুরাণ'। "শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বইটি পড়ে লিখিত ভাবে বললেন, মারকাটারিভাবে এখানেই থেমে থেক না। লিখে যাও।"[৩৪] পরবর্তীতে 'শবর পুরাণ' বৃহৎ আকার লাভ করে চার খন্ডের 'শবর চরিত' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। 'শবর চরিত' উপন্যাসটি প্রকাশের পর মহাশ্বেতা দেবীর প্রথমে ধারণা হয়েছিল কলকাতার কোন এলিট সম্প্রদায়ের লেখক নলিনী বেরা। যদিও পরে তাঁর ভ্রান্তি দূর হয় এবং একটি ৪৯ পাতার দীর্ঘ চিঠিতে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি যেটা পারেননি সেটা নলিনী বেরা করে দেখিয়েছেন। তিনি নিজেকে 'অস্তমান' ও নলিনী বেরাকে 'উদীয়মান সূর্য' বলেছেন। নলিনী বেরা কোনো শখের বশে লোধাদের বা ওই অঞ্চলের মানুষদের কথা বলেননি, তিনি তাঁর অন্তর থেকে একটা তাগিদ অনুভব করেছিলেন। যে অঞ্চলে তিনি জন্মেছিলেন সেই অঞ্চলের ঐতিহ্যকে তিনি বহন করছেন। সাহিত্যের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটানো যেমন তাঁর অধিকার তেমনই তাঁর দায়িত্বও বটে। জঙ্গল ছাড়া লোধাদের জীবন অকল্পনীয়, অথচ অরণ্য সংরক্ষণের যুগে জঙ্গল ঘেরা, সীমানা নির্ধারণ, সর্বোপরি জঙ্গলে অবাধ বিচরণ নিয়ন্ত্রণের ফলে লোধাদের জীবনে সংকটের ছায়া পড়ে। তারা এত আইন বোঝে না। তাই যখনই প্রয়োজন হয় তারা নির্দ্বিধায় ঢুকে পড়ে জঙ্গলে ফলত শাস্তি ভোগ করতে হয় তাদের। পুলিশ ফরেস্টগার্ডদের অত্যাচারের শিকার হতে হয় তাদের। শবরদের জীবনের এই ঘাত প্রতিঘাতকে তিনি খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন আর 'শবর চরিত' উপন্যাসে তা শিল্পিত রূপ

লাভ করেছে। তাদের দৈনন্দিন জীবনসংগ্রাম, অনুভূতি, আবেগকে 'ঘোড়া ও সর্ষেদানা'; 'বর্ষামঙ্গল'; 'অপারেশন পাঁচ কাহানিয়া', প্রভৃতি ছোটোগল্পে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তিনি কেবল তাদের বঞ্চনা আর লাঞ্ছনার কথা বলেন না, সেই সঙ্গে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ উৎসব ইত্যাদির কথাও বলেন। যার মধ্যে বাঁদনা পরব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নলিনী বেরা নিজেও এ সকল উৎসব অনুষ্ঠানের সামিল থেকেছেন। আর সেজন্যই হয়তো 'শবর চরিত' উপন্যাসের ভূমিকায় বলতে পেরেছেন;---- "এ উপন্যাস তাদেরই নিয়ে লেখা যারা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'শবর' ঋকবেদে 'অসুর' অমরকোষে 'ম্লেচ্ছ' মৎস্য আর বায়ু পুরাণে 'ক্ষত্রিয়'।...সভ্যতাদর্পী আর্যের দৃষ্টিতে তো নয়ই এ উপন্যাস বরঞ্চ অনার্যেতর এক আশ্চর্য নম্রতায় প্রায় তাদেরই একজন হয়ে লেখা।"[৩৫] তাঁর স্বচক্ষে দেখা পিঁদাড়ি লোধার জীবন গল্প কাহিনির থেকে কোন অংশে কম ছিল না। যেমন আকর্ষণীয় ছিল তার জীবন তেমনি লাবণ্যে ভরা ছিল তার মুখখানি। পিঁদাড়ির জীবন উড়িয়া যাত্রাপালা 'লোলিতা পালা'র সঙ্গে হুবহু মিশে গেছিল। "গভীর জঙ্গলে থাকতো বসুশবর, ভালো নাম বসুশ্রবা। সঙ্গে থাকত তার যৌবনবতী কন্যা লোলিতা। বসুশ্রবার আরাধ্য দেবতা নীলমাধবের বিগ্রহও ছিল সেই জঙ্গলে। রাজা ইন্দ্রদুম্ন একদিন নীলমাধবের মূর্তি চুরি করতে পাঠালেন বিদ্যা নামের এক ব্রাহ্মণকে। সেই বিদ্যার সঙ্গে লোলিতার প্রেম হলো। প্রেমে পড়ে নীলমাধবের সুলুক সন্ধান বাতলে দিয়েছিল লোলিতা।"[৩৬] ললিতা পালার মতোই গ্রামের হরিমন্দিরের পুরোহিত নারায়ণদাস ঠাকুরের সঙ্গে পিঁদাড়ির প্রণয় হয়। গ্রামের মানুষ এই প্রণয় সম্পর্কে অবগত হয়ে পুরোহিত পদ থেকে নারাণদাসকে বহিষ্কার করে। অপমানিত নারায়ণদাস জঙ্গলে লোধা বস্তিতে চলে যান, যজমানি ছেড়ে লোধাবৃত্তি ধরলেন। বছর দুয়েকের মধ্যে পিঁদাড়ির এক সন্তান জন্মায়। পিঁদাড়ি ও তার সন্তান গুড়ভার কথা নিয়েই 'ধর্মের গাড়ু' গল্পটি রচিত। তাছাড়াও নলিনী বেরার অধিকাংশ উপন্যাসে আমরা পিঁদাড়ি চরিত্রটিকে পেয়ে থাকি। এছাড়াও সাঁওতাল ও কুমোরদের কথাও তাঁর লেখায় বারে বারে উঠে এসেছে। সাঁওতালরা শবরদের থেকে অবস্থাপন্ন, তাঁরা শবরদের মতো জমিহীন নয়। কাঠ বালি ও মাটি এই তিনটে জিনিসের উপর কুমোররা নির্ভরশীল। কিন্তু অরণ্য সংরক্ষণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তাদের জীবনেও নেমে এসেছে সংকটের কালো ছায়া। 'শবর চরিত'; 'মাটির মৃদঙ্গ'; 'অপৌরুষেয়' প্রভৃতি উপন্যাসে কুমোরদের জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতকে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিবর্তনকে খুব বিশ্বস্ত করে তুলে ধরেছেন। নিজের জন্মভূমি, পরিবার-পরিজন, সেখানকার সাধারণ মানুষ, অন্ত্যজ মানুষ, পরিবেশ-প্রকৃতি সবকিছুকে নিয়ে নিজস্ব একটা ভুবন গড়ে নিয়েছিলেন তিনি। এই সবকিছুর মধ্যেই তিনি খুঁজে পান নিজেকে, নিজের অস্তিত্বকে, এদের নিয়েই তাঁর যত ভাবনাচিন্তা, তার লেখনি ধারণ। "এরা সবাই আমার আত্মীয়, বড় আপনার জন। এদের ছেড়ে শহরে এসে, মাঝে মাঝেই মনে হত, তারা সব কোথায় পড়ে আছে একলা একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। লেখার ভিতর দিয়ে সেই দ্বীপের সঙ্গে, সেইসব মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি দেখা হয় একটু আধটু কথাও বলি।"[৩৭]

গ্রামীণ আবর্তে জন্ম ও বেড়ে ওঠার কারণে গ্রামের লোকায়ত জীবনের সঙ্গে নলিনী বেরার পরিচয় ছিল অতি নিবিড়। গ্রামে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন-ছড়া, বিভিন্ন রীতি-নীতি, ব্রতকথা, আচার অনুষ্ঠানকে তিনি আত্তীকরণের মাধ্যমে গ্রহণ করেছিলেন এবং তার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্যে। এপ্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল টুসু গানের ব্যবহার। ছোটগল্পে সেভাবে সুযোগ না ঘটলেও তাঁর প্রায় অধিকাংশ উপন্যাসে টুসু গানের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন সাহিত্যিক। 'অপৌরুষেয়' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আনন্দীর জীবনের নির্ধারক হয়ে উঠেছে টুসু গান। টুসু গান ছাড়াও ওই অঞ্চলে প্রচলিত

লোককথা, পুরাণকেও খুব তাৎপর্যমণ্ডিত করে ব্যবহার করেছেন লেখক। যেমন লোধাদের জমি না থাকার পিছনে রয়েছে এক মিথ। শিব ঠাকুরের অভিশাপে তারা জমিহীন। শিব ঠাকুর লোধাদের চাষ করতে হাল গরু দিয়েছিলেন কিন্তু খুৎকাতর লোধারা সেই হাল গরুকেই কেটে খেয়েছিল, সেই থেকেই তারা জমিহীন। 'শবর চরিত' উপন্যাসে এই মিথের প্রয়োগ দেখা যায়। বহু কষ্ট করে লোধারা জমি লিজ নিলেও শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। লোকপুরাণ লোধাদের জীবনে সত্য হয়ে ওঠে। একইভাবে 'দালানের পায়রাগুলি' উপন্যাসে কালষণ্ডার পুজো করার বিষয়টি যেন বাস্তব পরিস্থিতিতে খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। মিথ পুরাণের মতো ভাষার ব্যবহারেও নলিনী বেরা সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি তার লেখার মধ্য দিয়ে নিজের জন্মভূমিকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। তার বহু বিচিত্র দিককে পাঠকের সামনে উন্মোচিত করেছেন আর তা সম্ভব হয়েছে ভাষার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে। "যে কোনো রচনার সৌন্দর্য বা প্রতিক্রিয়া বুঝতে হলে তার ভাষা শরীরকে অবশ্যই বুঝে নিতে হয়। লেখক আর পাঠকের মধ্যবর্তী সেতু হল এই ভাষা-ভাষার ধারাবাহিক শব্দমালা।"[৩৮] সাহিত্যের শিল্পরূপ নির্মাণে ভাষা হল প্রধান উপকরণ। তা কেবল বিষয়বস্তুর ভাব বহনকারী উপাদান নয়। সাহিত্য রচনা নেপথ্যে লেখকের যে বিশিষ্ট মনোভাব তথা ভাবনাচিন্তা থাকে সেই ভাবনা-চিন্তাকে যথাযথরূপে প্রকাশ করা হয় ভাষার মাধ্যমে। নলিনী বেরার সাহিত্যকর্মের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে তিনি ওই অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষাকে সাহিত্যে তুলে এনেছেন খুব নিপুণতার সঙ্গে এবং খুব দাপটের সঙ্গে। কিন্তু ভাষার জন্য তাঁকে বার বার সমালোচিতও হতে হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে সাহিত্য আকাদেমির এক আলোচনা সভায় আলোচকের ভুমিকায় ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁদের মতে নলিনী বেরার আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে। তা পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয়। এর উত্তরে নলিনী বেরা বলেছিলেন। এই ভাষা ব্যবহার তাঁর অধিকার এবং 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি যেমন ওই অঞ্চলের ভাষাকে বহন করে, ঠিক তেমনই তিনিও তাঁর অঞ্চলের ভাষাকে বহন করেন। সুবর্ণরেখা নদীপারের ভাষা এক মিশ্র ভাষা। ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের সীমান্তে অবস্থিত হওয়ার কারণে ওই অঞ্চলের বাংলাটা সাধারণ পাঠকের কাছে মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে হয়তো। কিন্তু নলিনী জানেন ওই ভাষা ছাড়া ওই অঞ্চলের সাহিত্য অসম্পূর্ণ। তাই তিনি সদর্পে ওই ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। যার ফলে তাঁর কাহিনি ও চরিত্রগুলি হয়ে উঠে জীবন্ত। নলিনী বেরা তাঁর যাপিত জীবন থেকেই গল্প-উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তিনি অকপট ভাবে বলে গেছেন জীবনের নানা স্মৃতি। নিজেকে নিজের পরিবারের মানুষদের বা তাঁর দেখা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের কখনো তিনি আদর্শ চরিত্ররূপে অঙ্কন করেননি। গ্রামের মানুষ মানুষের স্পর্শকাতরতা তাদের বিশ্বাস সংস্কার রীতি-নীতি মন মানসিকতা সবকিছুকেই নলিনী নিজের অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস দিয়ে বাস্তবানুগ করে গড়ে তুলেছেন। সমাজ-সংসারের অনেক উপলব্ধির গভীরতাকেই তিনি নিজের লেখার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন আর তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলি সেই উপলব্ধিকে আত্তীকরণ করে ফেলে। যার ফলে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য হয়ে ওঠে আরো সজীব। আর এভাবেই বাস্তবকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলি অন্য এক বাস্তবতার সন্ধান দেয়।

কথাকার নলিনী বেরা জন্মেছিলেন ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী সুবর্ণরেখা নদীতীরের বাছুরখোঁয়াড় গ্রামে। গ্রাম, গ্রামের প্রকৃতি মানুষজন সবই তাঁর কাছে ছিল খুব কাছের। চাকরিসূত্রে তিনি থাকতেন শহরে, ফলে ফেলে আসা গ্রাম তাঁর কাছে ছিল একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। সেই দ্বীপের স্মৃতিচারণায় তিনি নস্টালজিক, আর তাঁর সাহিত্য রচনার মূলেও রয়েছে সেই নস্টালজিয়া।

> "বাসে-ট্রামে গ্রামে-গঞ্জে হাতে-বাজারে যখন যেখানে থাকি, সময় নেই অসময় নেই ভুস্‌করে ভেসে ওঠে সেই গন্ধটা। কী বলে একে--নস্টালজিয়া? হয়তো তাই, তাই। যাই হোক, ওই নিয়েই আমার লেখালেখি, শুরু হল পথ চলা।...সেই গন্ধ সেই 'নস্টালজিয়া'কে সম্বল করে, সেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, দ্বীপের আপামর অধিবাসী আত্মীয়পরিজন ভূগোল ভূ-প্রকৃতি আবহাওয়া জলবায়ু নদনদী পাহাড়-টিলা-বন-ডুংরি গাছপালাসহ তাবৎ ভূখণ্ডকে যতটুকু পারি প্রত্নতাত্ত্বিক আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় খনন করে আবিষ্কার করতে চাই উপন্যাস রচনার অজুহাতে।"[৩৯]

একজন আবিষ্কারকের মন নিয়ে নলিনী বেরা সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে কাদের নিয়ে লিখবেন কোন প্রেক্ষাপটের কথা বলবেন সেই বিষয়েও ছিল তার এক নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার জগৎ, যে ভাবনা চিন্তা এসেছিল তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে। ওই অঞ্চলে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের সঙ্গে গভীর নিবিড় যোগ নলিনী বেরার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছিল। এবং যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার প্রতিটি লেখায়। ছেলেবেলায় 'চারবন্ধু চর্তুদ্বীপ' নামক একটি গল্পের সংকলন হাতে পেয়েছিলেন। সংকলনটির লেখকের নাম তার মনে নেই, মনে আছে ছোটো ছোটো কয়েকটি গল্পের সংকলন কিন্তু তার মনে হয়েছে বইয়ের পাতায় চিত্রসহ মুদ্রিত গল্পগুলির চেয়ে--- "আমাদের গ্রামে গ্রামের আশেপাশে বিলে বাতাসে বনে জঙ্গলে টাঁড়-টিকরে প্রতিনিয়তই নিত্যনতুন জ্যান্ত গল্প তৈরি হচ্ছিল, যা বইয়ের পাতায় কল্পিত গল্পগুলোর চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।"[৪০] সেই জ্যান্ত গল্পগুলোর সন্ধান করতে করতেই বাস্তব আর কল্পনার সংমিশ্রণে গড়ে তুলেছেন তাঁর প্রতিটি গল্প-উপন্যাসকে। কল্পনার মিশেল থাকলেও তিনি জঙ্গলমহলের যে বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে গল্প-উপন্যাসগুলিকে লিখেছেন, তার চরিত্রগুলিকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যেন গল্প রচনা করছেন না বরং গল্পগুলি তৈরিই ছিল তিনি শুধু সেগুলিকে শিল্পরূপ দান করেছেন। নলিনীর কলমে গ্রাম যেমন তার সমস্ত নির্যাস নিয়ে ধরা দিয়েছে, তেমনই শহরের চালচিত্র অঙ্কনেও তিনি সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। পড়াশোনা ও চাকরিসূত্রে তাঁর শহরে পাড়ি দেওয়া। শহরবাসের অভিজ্ঞতাও বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছে তাঁর লেখায়। কথাকার নলিনী বেরা বিশ্বাস করেন যে, একটা ঘোরের ভিতর সাহিত্য গড়ে ওঠে। আর একজন লেখক তার লেখার মধ্যে এটা নিজস্ব জগৎ তৈরি করেন যার সঙ্গে বাস্তবের হয়তো ঠিক মিল থাকে না কিংবা বাস্তব থেকে অন্যরকম। আর লেখক হিসেবে সেটাকেই তিনি মনে করেন 'রিয়েল' বাস্তব। নলিনী বেরাও তাঁর সাহিত্য রচনা মধ্য দিয়ে নিজস্ব একটা জগৎ তৈরি করেন, যে জগতের চরিত্ররা তার সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত প্রায় রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়র মতোই। তাদের সঙ্গে একমাত্র তিনিই স্বপ্নে জাগরণে এমনকি ঘুমিয়েও কথা বলতে পারেন। চরিত্রগুলির সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেন। আত্মকথনের ঢঙে বলে যান জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা। আর লেখার মধ্য দিয়ে পৌঁছে যান খণ্ড থেকে অখণ্ডে। পাড়ি দেন চেনা থেকে অচেনার জগতে। আর এজন্যই হয়তো তিনি 'শবর চরিত' উপন্যাসের উৎসর্গ পত্রে লিখতে পেরেছিলেন,---

> "বিগত প্রায় দশটা বছর আমি আছি রাইবু-গুড়গুড়িয়া-গুড়কুঁদা-শরাবন...লিলুয়াদের সঙ্গে। ছিলাম ডুবকা-ডুংরিতে বনে ঝাড়ে...খঙ্গা-রঙা শিকারে। ছিলাম নামাল খাটায়, দাঁতনে, কড়িয়া-বামনদায়। লেখা শেষ করে এই মুহূর্তে মনে হল, আমি বুঝি স্বজনহারাই হলাম।"[৪১]

সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে তিনি নিজের অস্তিত্বের সন্ধান করেছেন। আর তার জন্য পাশ্চাত্য রীতির বাঁধাধরা ছকে তিনি হাঁটেননি। তিনি দেশজ লোকজ রীতির অনুসারে বৃত্তান্ত, কথকতা, উপকথা, লোককথার

আদলে উপন্যাস ও ছোটোগল্পগুলিকে সৃজন করেছেন। কখনো রিপোর্টাজের আদলে কাহিনি নির্মাণ করেছেন। আবার কখনো আখ্যানভাগকে বাঁধতে চেয়েছেন মহাভারত বা রামায়ণের আদলে। বাল্যকাল থেকেই পুঁথি পাঠের আবহর মধ্যে তিনি থেকেছেন। জেনেছেন গল্প বলার একটা নিজস্ব রীতি আমাদের সেই প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। তিনি সেই ধারাকেই অব্যাহত রেখেছেন। পাশ্চাত্য মডেলকে অস্বীকার করে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে দেশজ-লোকজ ঘরানার যে নিজস্ব রীতি তিনি তা গ্রহণ করেছেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি চর্চার অনুশীলনের চেয়ে যথার্থ ভারতীয় বাস্তবতাকে নানাভাবে খুঁজে দেখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি লিখেছেন,---

> "উপন্যাসের আখ্যানভাগকে বাঁধতে চাই মহাভারত কি বিষ্ণুপুরাণের ঠাস বুনোটে।...চাইতে হয় তো চাইব সেই উপন্যাস লিখতে যার শুরুটা আমি করব কিন্তু কালে কালে রামায়ণ-মহাভারতের মতো 'ধরতাই' ধরবে পরবর্তী আখ্যানকারেরা, টিকা ও ভাষ্যকারেরা।"[৪২]

তথাকথিত মধ্যবিত্তের জীবন তাদের প্রেম অপ্রেম যৌনতা প্রভৃতি তাঁর রচনায় ভিড় করে আসেনি। কোনো সম্পাদক বা প্রতিষ্ঠানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে তিনি সাহিত্য রচনা করেননি বা জনপ্রিয় বিষয়গুলিকে গল্প-উপন্যাসের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করে নিজের শিল্পকর্মকে পণ্যে পরিণত করেননি বরং তিনি বরাবর নিজের লেখাটাই লিখেছেন। খ্যাতি পাওয়া বা জনপ্রিয় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা না থাকার জন্য তিনি অনায়াসে লিখে যেতে পারেন শবরদের কুমোরদের চরিতমালা। বিষয় উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি দু ধরনের বাস্তবতার নির্মাণ করেছেন - অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতা। আর সেই সঙ্গে মেতে উঠেছেন দেশীয় মিথের ভাঙা-গড়ায়। মিথের নব নব নির্মাণ ঘটিয়েছেন তিনি তাঁর রচনার মধ্যে। পাশাপাশি প্রয়োজন অনুসারে ভাষাকেও অনুকূলরূপে গড়ে নিয়েছেন। জীবনকে নতুনভাবে আবিষ্কার করাই ছিল তার সাহিত্য রচনা মূল উদ্দেশ্য। আর সেই উদ্দেশ্য বাস্তব রূপ লাভ করেছে গল্প-উপন্যাসের বিষয় নির্বাচন, রচনা কৌশল, মিথের প্রয়োগ ও সর্বোপরি ভাষা প্রয়োগে লেখকের নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাবনা চিন্তার উপর ভিত্তি করে। কোনো কিছুর দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে, নিজের মতো করেই বারবার তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয়কে বলে যান। আর এভাবেই কথাকার নলিনী বেরা তাঁর সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে নিজস্ব ভুবন নির্মাণ করেন যাপিত জীবন থেকে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে যেখানে পাঠক অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা লাভ করে।

ভাষার দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও নলিনী বেরা পাঠক সমাজে জনপ্রিয় ও সমাদৃত হয়েছেন। সমালোচনাকেও তিনি সাদরে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর সংকল্প থেকে কখনও পিছপা হননি। তিনি তাঁর নিজস্বতা ও মৌলিকত্বের জন্য ২০০৮ সালে 'বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' পান 'শবর চরিত' উপন্যাসটির জন্য। ২০১৯ সালে 'সুবর্ণরেখা সুবর্ণরেণু' উপন্যাসের জন্য তিনি পান 'আনন্দ পুরস্কার'। এছাড়াও 'বর্ণপরিচয়', 'সংবাদ প্রতিদিন' পুরস্কার, 'বেঙ্গল কেমিক্যাল যুগান্তর পত্রিকা পুরস্কার, প্রভৃতি নানা পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তিনি তাঁর জীবনের কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে একটা অঞ্চলকে সমগ্ররূপে তুলে ধরেছেন। তাই তাঁর জীবনের আলোচনায় তাঁর সাহিত্যের অলোচনাও খুব স্বাভাবিকভাবে চলে এসেছে। তবে তিনি কেবল সাহিত্য রচনার করেই থেমে থাকেননি, তিনি ওই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নেরও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এমনকি সাহিত্যিক হিসাবে পাওয়া বিভিন্ন পুরস্কারের আর্থিক মূল্যও তিনি দান করেছেন ওই অঞ্চলের মানুষদের জন্য। তিনি মনে করেন তাঁর পাওয়া পুরস্কারের আসলে ওই অঞ্চলের সকল মানুষের প্রাপ্য। তিনি তো তাদেরই প্রতিনিধি কেবল।

তথ্যসূত্র :

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, উৎসর্গ কাব্যগ্রন্থ, অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত।
২। ঐ, 'আত্মপরিচয়', অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত।
৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ,, কবিজীবনী, সাহিত্য, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা - ১৬৮।
৫। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'জীবনচরিত ও কবিত্ব', 'বঙ্কিমরচনাবলী' (২য় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ১৩৯২, পৃষ্ঠা – ৮৫৪।
৬। বেরা, নলিনী, আত্মীয় পরিজন-ভূগোল-ভূপ্রকৃতি, কোরক প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫, পৃষ্ঠা - ৫৯।
৭। গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১৩.১০.২০২৩।
৮। বেরা, নলিনী, আত্মীয় পরিজন-ভূগোল-ভূপ্রকৃতি, কোরকঃ প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫, পৃষ্ঠা - ৫৯।
৯। বেরা, নলিনী, সুবর্ণরেখা একটি নদীর নাম, শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-
১০। বেরা, নলিনী, বাবার স্মৃতি, শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা, ২০০৩, পৃষ্ঠা - ৩।
১১। বেরা, নলিনী, সুবর্ণরেখা একটি নদীর নাম, ভূমিকা - শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা, ২০০৩।
১২। তদেব।
১৩। তদেব।
১৪। তদেব।
১৫। তদেব।
১৬। বেরা, নলিনী, আত্মীয় পরিজন-ভূগোল-ভূপ্রকৃতি, কোরক:প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫, পৃষ্ঠা - ৬০।
১৭। তদেব, পৃষ্ঠা – ৫৯।
১৮। বেরা, নলিনী, জয়ের জন্য একটি পালক, দিবারাত্রির কাব্য, উপন্যাস সংখ্যা ৩, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা - ৩৭৪।
১৯। গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১৩.১০.২০২৩
২০। বেরা, নলিনী, জয়ের জন্য একটি পালক, দিবারাত্রির কাব্য, উপন্যাস সংখ্যা ৩, অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা - ৩৭৪।
২১। তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৭৫।
২২। চক্রবর্তী, অমলেন্দু, নলিনী বেরার ছোটগল্প, ভূমিকা - শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা, ২০০৩।
২৩। বেরা, নলিনী, আত্মীয় পরিজন-ভূগোল-ভূপ্রকৃতি, কোরক প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫, পৃষ্ঠা - ৫৫।
২৪। তদেব, পৃষ্ঠা -৫৬।
২৫। তদেব, পৃষ্ঠা – ৫২।
২৬। তদেব।
২৭। ঐ, চোদ্দমাদল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা – ৩৯।
২৮। বেরা, নলিনী, আত্মীয় পরিজন-ভূগোল-ভূপ্রকৃতি, কোরক:প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫,পৃষ্ঠা- ৫২।

২৯। ঐ, দালানের পায়রাগুলি, পরম্পরা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা – ১২।
৩০। বেরা, নলিনী, জয়ের জন্য একটি পালক, দিবারাত্রির কাব্য, উপন্যাস সংখ্যা ৩, অক্টোবর – ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা -৩৭২।
৩১। তদেব।
৩২। বেরা, নলিনী, আত্মীয় পরিজন-ভূগোল-ভূপ্রকৃতি, কোরক:প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫, পৃষ্ঠা - ৬০।
৩৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৪।
৩৪। তদেব।
৩৫। শবর চরিত, ভূমিকা, করুণা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৫।
৩৬। বেরা, নলিনী, আত্মীয় পরিজন-ভূগোল-ভূপ্রকৃতি, কোরক:প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫, পৃষ্ঠা – ৬১।
৩৭। জয়ের জন্য একটি পালক, দিবারাত্রির কাব্য, উপন্যাস সংখ্যা ৩, অক্টোবর – ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা - ৩৭২।
৩৮। সরকার, পবিত্র, গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১৬১।
৩৯। বের, নলিনী, আত্মীয় পরিজন-ভূগোল-ভূপ্রকৃতি, কোরকঃ প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫, পৃষ্ঠা -৫৮।
৪০। ঐ, শেকড়ের খোঁজে, কথাবয়ন, কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরা সংখ্যা, মার্চ ২০১৮, পৃষ্ঠা - ১৩৩।
৪১। ঐ, শবর চরিত, উৎসর্গ।
৪২। বেরা, নলিনী, জয়ের জন্য একটি পালক, দিবারাত্রির কাব্য, উপন্যাস সংখ্যা ৩, অক্টোবর – ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা – ৩৭৬।